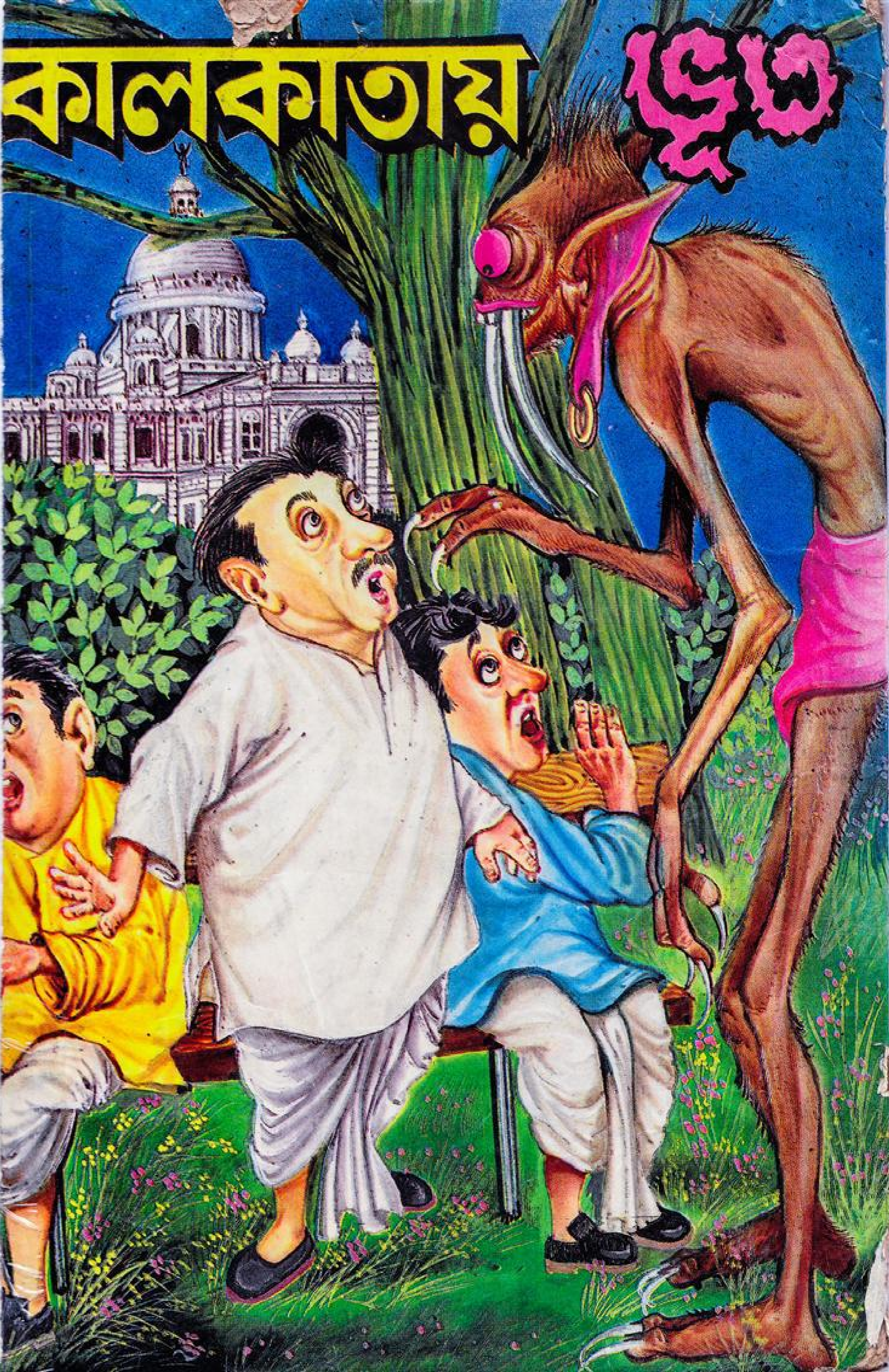
কলকাতায়
ভূত

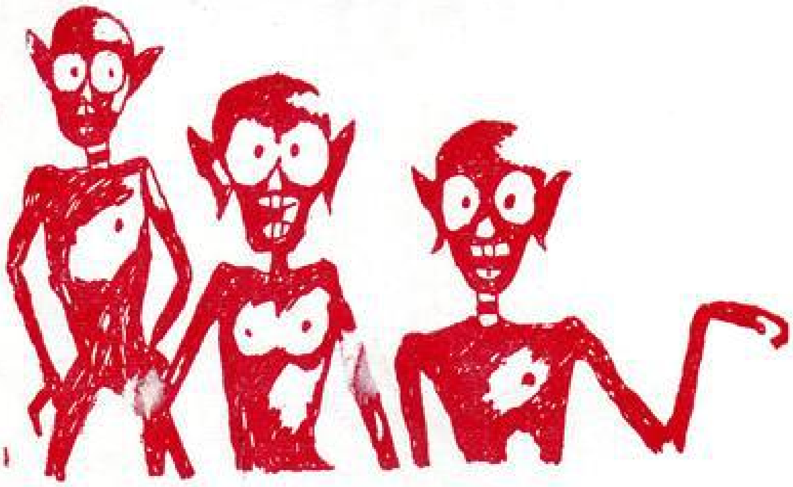

ছবি : ধীরেন শাসমল

প্রকাশক : শ্রীনির্মলকুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর : ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

দাম : আট টাকা

কোলকাতায় ভূত

নরহরি দাস সেদিন ঢাকুরিয়া ক্লাবে তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, বুঝলেন মশাই, কোলকাতায় আজো ভূত রয়েছে।

পটল গড়গড়ি মশাই নস্যি নিতে ভুলে গিয়ে নস্যির টিপটি ধরে রেখেই নরহরি দাস মশাইকে জিগ্যেস করলেন, কি বললেন, মিঃ দাস ? কথাটা বললেন কি ?

— কথাটা আমি বাংলাতেই বলেছি এবং জোরেই বলেছি বোধহয়।

ধপাস্ করে তাসটা রেখে বললেন নরহরি দাস মশাই।

নরহরি দাস এবং পটল গড়গড়ি মশাই চিরকালই আদা-কাঁচকলায়। অতএব পটল গড়গড়ি মশাই প্রশ্ন করতেই নরহরি দাস মশাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। পটল গড়গড়ি মশাই টিপ্পনি কাটার সুরে বললেন, বলেছেন ঠিকই, আমি শুনেছি ঠিকই, কিন্তু কি যে শুনলুম ঠিক বুঝতে পারলুম না। যদি দয়া করে পুনরায় বলেন।

—আমার মনে হয় আপনার কানে একটি যন্ত্র ধারণ করা বিধেয়। কানে যাঁরা কম শোনেন, আজকাল সকলেই যন্ত্র ধারণ করে থাকেন।

— আপনার উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ, তবে একটু আগে যে কথাটি বললেন সে কথাটির যদি পুনরাবৃত্তি করেন বিশেষ বাধিত বোধ করব। ধন্য হবো।

—তাই নাকি!

অন্যান্যদের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে নরহরি দাস মশাই একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, মনটা আজ ভালই —একটু আগে তাসে জিতলাম — অতএব পটলবাবুকে বাধিতই করি। কি বলেন আপনারা?

গয়ারামবাবু সবিনয়ে নরহরি দাস মশাইকে বললেন, আমি কথাটা ঠিক শুনতে পাইনি, অতএব পটলবাবুর সঙ্গে যদি আমাকেও বাধিত করেন—

নরহরি দাস মশাই বিড়িতে একটা টান দিয়ে বললেন, বুঝলেন মশাই, খোদ কোলকাতা শহরে আজো ভূত আছে।

পটল গড়গড়ি মশাই প্রায় চোখ ট্যারা করে বললেন, অ্যাঁ — বলছেন কি?

—হ্যাঁ, নির্যস কথাই বলছি।

—কি যা-তা বকছেন?

নরহরিবাবু চটে গিয়ে বললেন, আমি যা-তা বকছি না মশাই, আপনিই যা তা বকছেন।

পটলবাবু নরহরিবাবুকে জিগ্যেস করলেন, আপনার নামটি যেন কি?

নরহরিবাবু মুখ ভেংচে বললেন, নামও ভুলে গেছেন! আপনার নিজের নামটি মনে আছে তো? —না স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন, গড়গড়ি মহাশয়!

– যাই বলুন, আপনার নাম নরহরি দাস না হয়ে গুলুরাম দাস হওয়াই ঠিক ছিল। অর্থাৎ উচিত হোত!

– কি বললেন ? আমি গুলুরাম —আমি গুল দিচ্ছি ? আপনারা সব সাক্ষী রইলেন—আমি মিঃ পটল গড়গড়ির নামে মানহানির মোকদ্দমা করব। কেস ঠুকে ঠুসে দেব একদম।

পটল গড়গড়ি খিক্ খিক্ করে হেসে বললেন, নালিশ করুন, তবে আদালত থেকে আপনাকে ও রাঁচীর পাগলা গারদে পাঠাবে এটা মনে রাখবেন দয়া করে।

—কেন, কেন ?

—কেন আবার ? আপনি বলছেন খোদ কোলকাতায় আজও ভূত আছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?

— একশ'বার আছে, হাজার বার আছে।

— এটা বিংশ শতাব্দী ভুলে যাবেন না। মাথায় গন্ডগোল না হ'লে, কেউ এমন কথা বলে ?

— আর যদি আমি প্রমাণ দিতে পারি যে খোদ্ কোলকাতায় এখনও ভূত আছে, আগেও ছিল, এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে! আপনাদের মতো সভ্য এবং অসভ্য মানুষদের দিব্যি কলা দেখিয়ে তাঁরা এখনও টিঁকে আছেন এবং আরও শত শত বছর ধরে টিঁকে থাকবেন।—এব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে যে-কোন টাকার অঙ্কে বাজী ধরতে পারি।

– বলেন কী ?

নরহরিবাবু বললেন, ঠিকই বলছি, এই অধম এগিয়ে গিয়ে কখনও পিছিয়ে যায় না এবং যা বলে তা প্রমাণ করে ছাড়ে।

আমরা পটলবাবুকে উস্‌কে দিয়ে বললুম, নরহরিবাবু যদি এগিয়ে যেতে পারেন, ঢাকুরের গড়গড়ি-বাজারের মালিক হয়ে আপনার কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া শোভা পায় না, পটলবাবু।

উস্‌কে দিতেই পটলবাবু দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, বেশ আমি দু'হাজার টাকা বাজি রাখলুম, একমাসের মধ্যে আপনাকে এই খোদ কোলকাতায় ভূত দেখাতে হবে।

এমন সময় আমাদের ক্লাবের বেয়ারা বার-কড়ি বললে, কোলকেতায় ভূত রইয়েচে কিনা জানিনে---তবে আমাদের মেদিনীপুরের গোপী গঞ্জিতি ভূত রইয়েচে শ্মশানে গেলি দেখতি পারা যায় এখুনও।

পটলবাবু বার-কড়িকে ধমক লাগিয়ে বললেন, চুপ কর, হচ্ছে কোলকাতার কথা, উনি নিয়ে এলেন গোপীগঞ্জের কথা! যত্তোসব —কি মিঃ নরহরি দাস এবার চুপ কেন? জোঁকের মুখে নুন পড়েছে বুঝি, সব খেল খতম?

নরহরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সচরাচর আমি বাজী ধরি না, কিন্তু আজ ধরলুম। একমাসের মধ্যে আমি যদি এই খোদ কোলকাতায় ভূত দেখাতে না পারি তবে আপনাকে আমি তিন হাজার টাকা দেব পটলবাবু। এককালের জমিদার নরহরি দাস উঠতি বড়লোক পটল গড়গড়ির ভয়ে সিঁটকে যায় না। পিছু নহী হট্‌তা—

নরহরিবাবু কথাটা বলেই পা দোলাতে লাগলেন।

যদু উকিল আমাদের তাসারু ক্লাবের সদস্য। তিনি বললেন, শুধু মুখের কথায় কাজ হইবেক না, লেখাপড়া করিতে হইবেক, সাক্ষী সাবুদেরও সহি থাকিবেক। আর টাকা জমা রাখিতে হইবেক। মুখে জগৎ মারিলে চলিবেক না, কাজে করিয়া দেখাইতে হইবেক।

পটলবাবু নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে দিয়ে বললেন, ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। আপনি মুসাবিদা করে লিখিত করুন আমি সই করে দিচ্ছি। আর কার কাছে টাকা জমা দিতে হবে বলুন, আগামী কালই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তার কাছে জমা রাখছি।

যদু উকিল বললেন, মুসাবিদা করে শর্তাদি লিখতে কিছু যে খরচ হবে?

নরহরিবাবু জিগ্যেস করলেন, দু'জনে দশ দশ করে দিলেই চলবে তো?

রিটায়ার্ড মধু দারোগা বললেন, যদুরতো কোন আয়-উপায় নেই—মাঝে মাঝে ছেঁড়া সাম্‌লা গায় দিয়ে আদালতে বসে থাকে——এসুযোগে যদি বিশটা টাকা উপায় হয় মন্দ কি?

মধু দারোগার কথা শুনে যদু উকিল ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন, দেখ মধু, আঁতে ঘা দিয়ো না। উকিলরা কখনও তোমার মতো ঘুষ খায় না।

— ঘুষ খাওয়ার সুযোগ কোথায়? মক্কেলই জোটে না। মক্কেল জোটানোর

জন্যে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে থাকতে হয়।

—দেখ মধু, আমাকে মক্কেলের জন্য বসে থাকতে হয় না, আদালতে গেলে——মক্কেল আমার পায়ে এসে গড়াগড়ি যায়।

— তাতো ছেঁড়া সাম্‌লা দেখেই বোঝা যায়।

দু'জনে তর্কাতর্কি করতে করতে যখন হাতাহাতির অবস্থা, তখন পটলবাবু মাঝখানে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন ? আমরা দশ দশ করে দিতে রাজি আছি যখন, মধুবাবুর যদুবাবুকে এভাবে হেনস্থা করা ঠিক হচ্ছে না।

মধুবাবু বললেন, আপনিতো সব ব্যাপারেই রাজি কিন্তু আপনার জবাবদার লিখিতং পড়িতং শুনে আর টাকা জমা নিতে হবে শুনে কি রকম যেন চুপসে গেছেন !

নরহরিবাবু বললেন, এক কালের ডাকসাইটে জমিদার বংশের ছেলে ঐ সব থোরাসা টাকার জন্যে চুপসে যায় না। সই করব, কাল টাকাও জমা দেব, কিন্তু–। পটলবাবু বললেন, এর মধ্যে আবার কিন্তু আসে কোত্থেকে ? আপনি নরহরি গড়গড়ি—আপনি কিন্তু কিন্তু করছেন কেন ?

—কিন্তু কি আর সাধে করছি মশাই ! এই ভূত দেখানোর ব্যাপারে আমাকে আমার গুরুদেব ভূতভাবন বাবাকে ডিসটার্ব করতে হবে কিনা—যা প্রচন্ড রাগী তিনি !

—ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

—ঠিক আছে, আর ভাবাভাবির দরকার নেই, যা হবার তা হবে, ক্যায়া পরোটা হ্যায়?

—কথাটা পরোয়া হবে।

—ওই হ'লো। বেশ, কালই টাকা জমা দেব, সইও করব। কিন্তু টাকাটা জমা দেব কার কাছে?

যদু উকিল বললেন, ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ গদাই নস্করের কাছে উভয়েই বাজীর টাকাটা জমা রেখে রিসিট নিয়ে নেবেন।

পটলবাবু বললেন, আমার আপত্তি আছে।

নরহরিবাবুও বললেন, আমারও আপত্তি আছে।

যদু উকিল জিগ্যেস করলেন, কেন?

পটলবাবুই এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুখ খুললেন প্রথমে, গদাই এ-ক্লাবের সেক্রেটারী হ'লেও গেঁড়া মারার ব্যাপারে ওস্তাদ। একটি আস্ত গেঁড়াকল আর কী!

নরহরিবাবু বললেন, ঠিকই! ও একটি গেঁড়াকল বিশেষ!

যদুবাবু জিগ্যেস করলেন, কিরকম?

—ছ' মাস আগে ছ'দিনের কথা বলে আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল। ক্লাবে এলে টাকাটা চাইলে বলে—বাড়িতে এসো। আর বাড়িতে গেলে ওর চাকর বটকেষ্ট বলে, বাবু এখুন গদা ঘোরাতেছেন——এখুন ডাকিলে মাথায় মারিকিরি ফাট্টাই করি দেবেন।

পটলবাবু নরহরিবাবুর কথায় সায় দিয়ে বললেন, গদাইয়ের কাছে টাকা রাখলে সে-টাকা ফেরত পাওয়া খুবই মুশকিল হবে। টাকাটা বরং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হেরম্ববাবুর কাছেই জমা রাখব।

—সেই ভালো।

অতএব পরদিনই যদু উকিল কাগজপত্র তৈরি করে ফেললেন। সই-সাবুদ হোল। সাক্ষীদেরও সই হোল। পটলবাবু হেরম্ববাবুর কাছে দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিলেন——আর নরহরিবাবুও তিন হাজার টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নিলেন। লেখাপড়ার কাজ শেষ হ'লো।

মধু দারোগা বললেন, যাক্‌গে যেই হারুক বা জিতুক, এই ক্লাবে বসে মাংস

পরোটা দিব্যি পেটপুরে খাওয়া যাবে একদিন।

যদুবাবু বললেন, সে গুড়ে বালি।

—গুড়ে বালি কেন?

—সকলেই মাংস পরোটা খেলেও তোমায় দেওয়া হবে না।

—কেন?

— আবার জিগ্যেস করছ? লজ্জা করে না তোমার? হার্ট ডিসিজে ভুগছ——দু'বারতো প্রায় টেঁসে গিয়েছিলে——এখনও মাংস-পরোটার লোভ ছাড়তে পারনি? লোভী, বেল্লিক!

এমন সময় ক্লাবে লম্বাচুলওয়ালা দিব্যি সাধুগোছের একটি লোক এসে ঢুকলেন, পোশাক দেখে মনে হল সাধু না হ'লেও হাফ্‌সাধু।

তিনি ঢুকে বললেন, আপনাদের এখানে কি করা হয়?

পটলবাবু বললেন, এই রিটায়ার্ড হয়ে বুড়ো বয়েসে আমাদের মতো কিছু বয়স্ক লোক এখানে এই তাস-দাবা খেলে একটু সময় কাটাই আর কী? আপনি?

—আমার নাম উড়নচণ্ডী বাবা।

—কোথায় থাকেন?

— কাছেও থাকি, আবার দূরেও থাকি। ঘরেও থাকি, আবার বাইরেও থাকি।

মধু দারোগা বললেন, এককালে আমি এক ডাকসাইটে দারোগা ছিলাম, ওসব হেঁয়ালি না করে—কি উদ্দেশ্যে হেথা আগমন পস্টাপস্টি বলুন। ভড়কি দেবার চেষ্টা করবেন না —

উড়নচণ্ডী বাবা মধুবাবুর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কি মধু কারফর্মা নাকি?

—হ্যাঁ, আমার ভয়েতে এককালে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত।

উড়নচণ্ডী বাবা খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠে বললেন, চিনেছি তুমি একবার বাঁক্‌ড়া জেলার রাইপুর থানার দারোগা ছিলে। ওখানকার ভৈরববাকির চ্যাংড়া সাঁওতাল ডাকাত তোমাকে গাছের সঙ্গে সারাদিন বেঁধে রেখেছিল। নাক কান বেশ করে বারবার মুলে দিয়েছিল। তারপর নাকে খৎ দেওয়ায় ও কান্নাকাটি করায় তোমায় ছেড়ে দিয়েছিল, তাই না?

বেলুন ফুটো করে দিলে যেমন চুপসে যায়, উড়নচণ্ডী বাবার কথা শুনে এক-কালের ডাকসাইটে দারোগাবাবু তেমন চুপসে গিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

যদু উকিল টিপ্পনি কেটে বললেন, কি আমার ডাকসাইটে দারোগা ছিলেনরে বাবু, চ্যাংড়া ডাকাত বেঁধে রেখে নাক মুলে দেয়। ভাগ্যিস উড়নচণ্ডী বাবা এসে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন—নইলে ব্যাপারটা তো জানাই যেতো না।

উড়নচণ্ডী বাবা বললেন, ওহে দারোগাবাবু, যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও—তবে শনিবার বা মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে সন্ধ্যেবেলা নিমতলা শ্মশান ঘাটে এসো, বুঝলে?

একথা বলে উড়নচণ্ডী বাবা ঝড়ের বেগেই ক্লাব-ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

উড়নচণ্ডী বাবা চলে যাওয়ার পর মধুবাবু বললেন, এর আগে কখনও উড়নচণ্ডী বাবার নাম শুনিনিতো। একেবারে ঝড়ের বেগে এলেন, আবার ঝড়ের বেগে চলে গেলেন! যত্ত সব ভণ্ড, বুজরুক, গেড়্ডাফেরাস!

যদুবাবু বললেন, উড়নচণ্ডী বাবা থাকতে তো একটা কথা বলোনি। মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলে। যেই চলে গেলেন অমনি মুখে খই ফুটছে—

হঠাৎ আবার দমকা হাওয়ার মতো উড়নচণ্ডী বাবা এলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে উড়নচণ্ডী বাবার ছায়ামূর্তি দেখা গেল। সেই সঙ্গে তাঁর গলার স্বরও শোনা গেল, ওরে মধু দারোগা, তুই আমাকে ভণ্ড, বুজরুক আর গেড়্ডাফেরাস বলেছিস?

মধুবাবু ভড়কে গিয়ে বললেন, আপনি তো চলে গিয়েছিলেন, আমি যে আপনাকে এসব বলেছি আপনি কি করে শুনলেন?

—আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনেছি। তোরে আমি ছাড়বনারে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মধুবাবু জিগ্যেস করলেন, আমায় নিয়ে আপনি কি করবেন, বাবা, এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন।

উড়নচণ্ডী বাবা অন্ধকারের মধ্যেই নেচে উঠলেন। বেয়ারা মোমবাতি জ্বালিয়ে আনছিল, কিন্তু উড়নচণ্ডী বাবার নাচের গমকে সেই মোম নিভে গেল। তার গলা

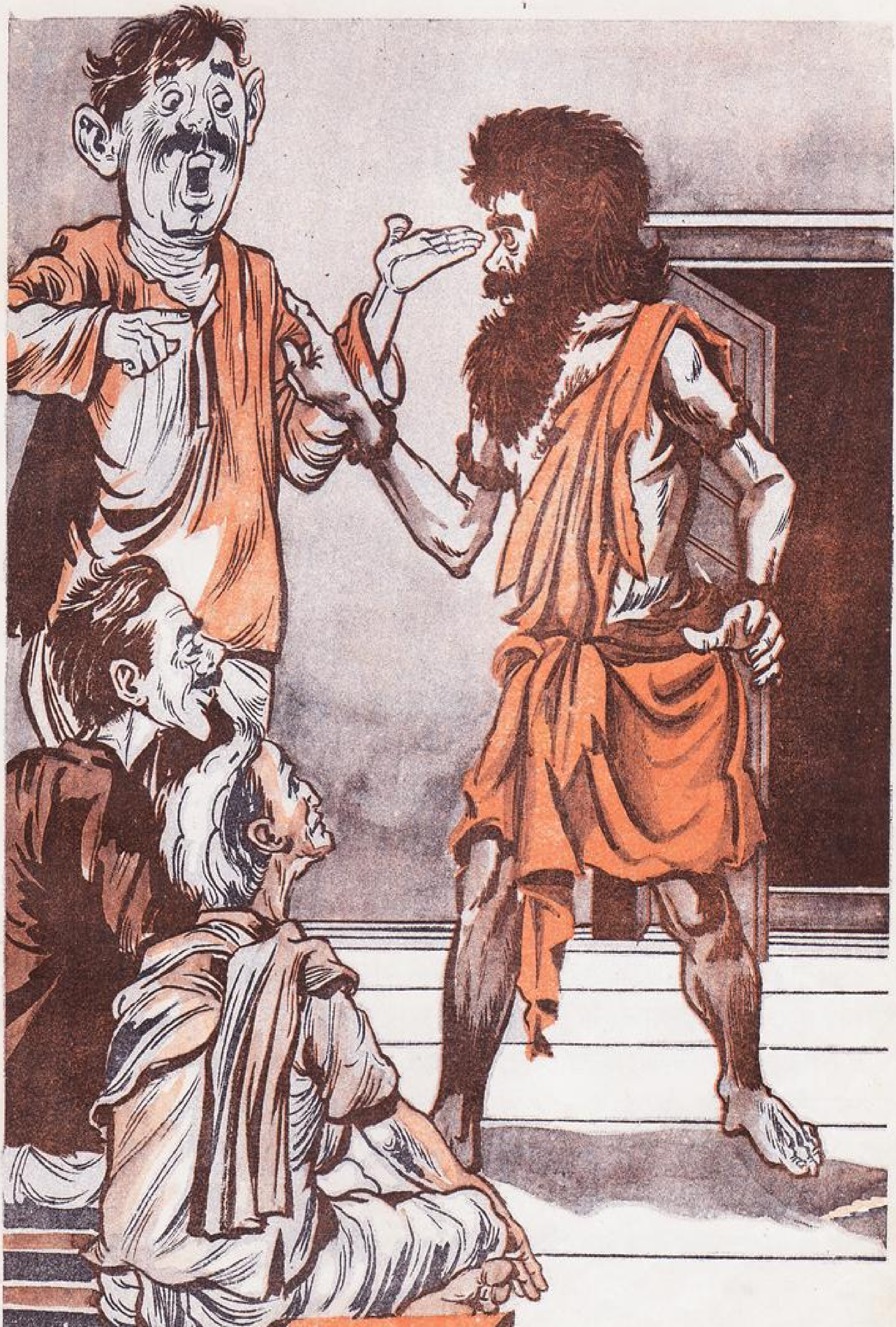

শোনা গেল, ওরে মধু তোকে আমি সহজে ছাড়ছি নে। তুই আমাকে ভন্ড, বুজরুক আর গেড়্ডাফেরাস বলেছিস।

মধুবাবু ভয় পেয়ে আর্তচিৎকার করে উঠে বললেন, উরে বাবা ! উরে ! এবারকার মত রেহাই দিন বাবা !

— তোকে আমি রেহাই দেব না, তোর হাতে দু'মাসের মধ্যেই হ্যারিকেন ধরিয়ে ছাড়ব।

—লোডশেডিং-এর মধ্যে সকলকেই হ্যারিকেন ধরতে হয়—এ আর নতুন কি ?

অন্ধকারের মধ্যেই উড়নচন্ডী বাবা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললেন, ওরে এ-হ্যারিকেন—সে-হ্যারিকেন ধরা নয়। তোকে আমি আমার চেলা বানাব। আমি আজ পর্যন্ত কোনো চেলা বানাইনি—তোকে চেলা বানাব বলেই আমি এখানে এয়েচি। তোকে চেলা বানাব। তোকে আমি নাঙা ফকির বানিয়ে ছাড়ব।

হঠাৎ দুম্ করে আলো জ্বলতেই দেখা গেল—উড়নচন্ডী বাবা উধাও হয়ে গেছেন। আর মধুবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

যদুবাবু মধুবাবুর পেছনে লাগলেও মধুবাবুকে ভালোও বাসতেন। তাই মধুবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পাবেন না মধুবাবু, পাগলা উড়নচন্ডীবাবা চলে গেছে, পাগলাই বটে।

এতক্ষণ পর মধুবাবু একটু ধাতস্থ হলেন। তারপরই তড়পাতে লাগলেন, আমি ভয় মোটেও পাইনি, আমাকে ভয় পাওয়ানো অতো সহজ ব্যাপার নয়। তবে ব্যাটা পাগলা হ'লেও সেয়ানা পাগল, বলে কিনা আমার হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে ছাড়বে — কতবড় আস্পর্দা !

যদুবাবু ফোড়ন কেটে বললেন, শুধু কি হাতে হ্যারিকেন ধরানো ? আবার বলে কিনা তোমায় চেলা বানিয়ে ছাড়বে, তোমায় নাঙা ফকির বানাবে।

মধুবাবু চিৎকার করে বললেন, ওর চেলা হ'তে আমার বয়ে গেছে ! আবার আসুক ব্যাটা, ক্লাব থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। উজবুক, বেল্লিক, গেড়্ডাফেরাস —

পল্টুবাবু বললেন, যাকগে, উড়নচন্ডী বাবার অনুপস্থিতিতে তাকে আর গালাগালি দিয়ে লাভ নেই। হয়তো আড়ালে লুকিয়ে বসে রয়েছেন, আবার কখন

ক্লাব-ঘরে এসে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে বসবেন কে জানে ?

শনিবার দিন নরহরিবাবু একেবারে গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এলেন।

—কি ব্যাপার ?

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন, সকলেই গাড়িতে রয়েছেন।

—কী ব্যাপার ?

—সেই ভূতের ব্যাপার !

—তা ভূতের ব্যাপার তো, আমি কি করব ?

—সবাই আছে, আপনিও চলুন।

—তা কোথায় যেতে হবে ?

—নৈহাটি ছাড়িয়ে গরিফাতে।

—ওখানে কেন ?

—আরে ওখানেই তো আমার গুরুদেব ১০৮ শ্রীতান্ত্রিকাচার্য ভূতভাবন বাবা থাকেন।

— কিন্তু গরিফাতে ভূত দেখালে তো হবে না, আপনাকে তো খোদ কোলকাতায় ভূত দেখাতে হবে মশাই।

—তা বাবার ওখানে গেলে বাবাই বলে দেবেন কোলকাতার কোথায় কোথায় ভূতের আড্ডাখানা। বাবার নির্দেশমতো সেই সেই জায়গায় হানা দিলেই ভূত বা ভূতদের দর্শন পাওয়া যাবে। পটলবাবুর দু'হাজার টাকা গচ্চা গেল অর্থাৎ ফুটে গেল। আমার গুরুদেব তন্ত্রসিদ্ধ ভূতভাবন বাবাইতো বলেছিলেন সেদিন, কোলকাতায় আজও ভূত আছে, শুধু একটা দু'টো ভূত নয়, নানারকম ভূত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—আপনার গুরুদেব ভূতদের সব খবরাখবর রাখেন বুঝি ?

— রাখেন বৈকি। বাবার কথা ভূতেরা শুনতে বাধ্য। কতো ভূত তাঁর কথায় ওঠ-বস করে। আমার গুরুদেব ভূতভাবন বাবা স্বয়ং মহাদেবের অংশ—তাঁর অসাধ্য কিছু নেই।

— ঠিক আছে, নরহরিবাবু, আমি দশমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি।

এক যাত্রায় আর পৃথক ব্যাপার কেন ? তাছাড়া ভূত দর্শনের ব্যাপারে আমারও

আগ্রহ কম নয়। আর গ্রাম-গঞ্জের ভূত নয়, খোদ কোলকাতার ভূত। অতএব দেখার ব্যাপারে আগ্রহ তো হবেই। আর ভূত দেখার আগে নরহরিবাবুর গুরুদেব ভূতভাবন বাবার দর্শন পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা।

গাড়ি নিয়ে গরিফার শ্মশান-ঘাটে পৌঁছতে প্রায় তিন ঘন্টাই লেগে গেল। কোলকাতা থেকে পথ তো আর কম নয়। সেই নৈহাটি ছাড়িয়ে গঙ্গার পাড়ে যে রেলব্রীজ ব্যান্ডেল ও নৈহাটির সংযোগ সাধন করেছে, বলতে গেলে প্রায় সেই রেলব্রীজের কাছাকাছি।

শ্মশানের কাছে একটি চালাঘরে ভূতভাবন বাবা থাকেন। বাবা যেমন নিজে ঘন ঘন চা খান, তেমনি বিশিষ্ট অতিথিদের চা খাওয়ান। অর্থাৎ ঐ চালাঘরেই চা দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

নরহরিকে দেখেই ভূতভাবন বাবা এক হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কিঁউ আয়া? কিঁউ আয়া? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিস, এটা কি ফুর্তির জায়গা?

—না, বাবা ফুর্তি করতে আসিনি।

—তবে?

—কোলকাতায় যে আজও ভূত আছে গুরুদেব, তা আপনার মুখেই কিছুদিন আগে শুনেছিলুম।

—তো ক্যায়া! কলকাত্তামে হর জায়গামে ভূত হ্যায়, তো ক্যায়া?

ভূতভাবন বাবার রুদ্রমূর্তি মাথায় জটা, চোখ দু'টো জবা ফুলের মতো লাল। ঘরের মধ্যে নানা জায়গায় মরার খুলি, হাড়গোর পড়ে আছে।

নরহরিবাবু ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, বাবা, আমায় বাঁচান, বাবা আমায় বাঁচান।

ভূতভাবন বাবা চিৎকার করে উঠে বললেন, তেরা কুছ নেই হুয়া —উল্লুককে পাট্টা, বুরবাককে আন্ডা, উঠ্ উঠ—নেহী তো মার দেগা ডান্ডা। কর দেগা বিলকুল ঠান্ডা।

নরহরিবাবু আমাদের আগেই বলেছিলেন যে, তাঁর গুরুদেব গালাগালি দিলে যেন আমরা ভয় না পাই। গালাগালি দেওয়াই নাকি ওঁর খুসি হওয়ার লক্ষণ।

নরহরিবাবু অবশ্য ভূতলে কপাল ঠেকিয়ে পড়ে রয়েছেন। এদিকে তাঁকে মারবার জন্য বিরাট এক লোহার চিমটে তুলে ভূতভাবন বাবা চিৎকার করে বলছেন, ডান্ডা মারকে তেরা খুলিকা ঘিলু নিকাল দেগা।

পেছন থেকে গুরুদেবের এক চেলা না ধরলে—হয়তো বা নরহরি দাস মশায়ের মাথা ফেটে দু'ফাঁক হয়ে যেত। আমরা ভাবছি কি খুনে গুরুরে বাবা!

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব আবার চিৎকার করে উঠলেন, উঠ্, উঠ্ — বোল্, ক্যায়া বোলনা।

অতএব নরহরিবাবু উঠে বসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, গুরুদেব আপনি বলেছিলেন—কোলকাতায় আজও ভূত আছে।

—বোলা থা।

—আমি সে-কথা বলাতে বন্ধু-বান্ধব আমাকে হেসে উড়িয়ে দিল, কত ঠাট্টা করল।

—সো তো করবেই, আমি তুকে না বলেছিলাম অসম্ভব কথা শুনলে বা অসম্ভব কিছু দেখলেও কাউকে বলবি নে, বুলেছিস কেন ?

— গুরুদেব, গল্‌তি হয়ে গেছে। আজ থেকে একমাসের মধ্যে কোলকাতায় ভূত দেখাতে না পারলে পটলবাবুকে আমায় তিন হাজার টাকা দিতে হবে—বাজী ধরা হয়েছে।

গুরুদেব জিগ্যেস করলেন, কৌন্ পহ্‌টোলবাবু ?

নরহরিবাবু পটলবাবুকে দেখিয়ে দিলেন। ভূতভাবন বাবা কট্‌মট্ করে পটলবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পটলবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, উনি আপনার নাম করেন নি বাবা, এর মধ্যে আপনি আছেন জানলে বাজী ধরতুম না। আমার কোন কসুর নেই, বাবা। আমায় মাপ করে দিন।

—ঠিক আছে, তুকে আমি এখানেই ভূত দিখাবো। শনিবার সন্ধ্যেবেলা চলিয়ে আয় সোব, শুধু ভূত দিখাবে না, ভূতের সঙ্গে কুথা বলিয়ে দেবে—সমঝ্‌লি।

পটলবাবু নরহরিবাবুর দিকে তাকালেন। নরহরিবাবু গুরুদেবকে বললেন, বাবা, এখানে ভূত দেখালে চলবে না। খোদ কোলকাতায় ভূত দেখাতে হবে।

নরহরিবাবুর গুরুদেব ভূতভাবন বাবা কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন, কাগজ কলম বের করে সময় তারিখ সব নোট করিয়ে নে তোরা—কোলকাতার কোন জায়গায় কোন সময় ভূত দেখনেকো মিলেগা।

পটলবাবু জিগ্যেস করলেন, ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারব, বাবা ?

— কিনো পারবি নে, জরুর পারবি। তোদের সঙ্গেই দেখা করার জন্যে ভূত আসবে। লিখে নে—বাংলা ৫ই ভাদ্র, শনিবার ইংরাজী তারিখ ২১ আগস্ট, ১৯৮৭

খৃষ্টাব্দ। ঢাকুরিয়া লেক, বর্তমান রবীন্দ্র সরোবর, তোরা রাত ন'টার পরে একটা বেঞ্চিতে সেখানে বসে থাকবি। ওখানেই তোদের সঙ্গে এসে ভূত দেখা করবে, কথা বলবে।

পটলবাবু বললেন, আমরা কতজন থাকব ? ভূতেরা আবার বেশি লোক দেখলে, ঘাবড়ে যাবে নাতো।

ভূতভাবন বাবা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, বললেন, ভূতেরা ভোয় কাকে বলে জানে না। তোরা সবাই মিলে যেতে পারিস।

— কিন্তু সেটা যে ভূত বুঝব কি করে ?

—দেখবি কোনো ছায়া পড়বে না, কঙ্কালরূপে দেখতে চাইলেও দিখা মিলবে, তাছাড়া কারো কাছে লাইসেন করা পিস্তল থাকলেও গুলি করে দিখতে পারিস।

মধুবাবুও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এতক্ষণ বাদে মুখ খুললেন, আমার কাছে লাইসেন্স করা পিস্তল আছে, গুলিও ভরে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ভূত ভেবে লোককে গুলি করে ফেঁসে যাব না'তো বাবা ?

— আরে না না। তুই আমায় বিশোয়াস্ করতে পারলি নে? ঠিক আছে, ভূতকে বলে দেব, তোদের কাছে ভূত নিজের পরিচয়ও দেবে—তখন গুলি করিস।

— ঠিক আছে, বাবা।

নরহরিবাবু সকাতরে বললেন, বাবা, আরও কয়েকটা জায়গা আর তারিখ বলুন—যেখানে কোলকাতায় ভূতেদের দেখা পেতে পারি। ধরুন, ঢাকুরিয়া লেক ঢাকুরিয়ার কাছে হ'লেও যদি কোনো কারণে সেদিন না যেতে পারি।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, আরও সময় স্থান ও তারিখ লিখে নে—৮ই আগস্ট, মঙ্গলবার ১৯৮৭ তারিখে বেলা দু'টোর সময় লালদিঘির ওখানে থাকলেও দু' একটা ভূতের দেখা পাবি।

—হ্যাঁ?

— হ্যাঁ। তাছাড়া ২৯ শে আগষ্ট শনিবার, ১৯৮৭—রাত দশটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ময়দানে দিখা পাবি।

তারপর ১৯৮৭-র পয়লা সেপ্টেম্বর শনিবার, কেওড়াতলা শ্মশানে রাত দশটার পরে গেলে ভূতেদের নাচ দিখতে পাবি।

পটলবাবু বললেন, থাক বাবা, আর দরকার নেই। এই কটা ভূতের সঙ্গে দেখা করতে পারলেই যথেষ্ট।

ভূতভাবন বাবা বললেন, তবে একটা কথা শুনে রাখো, যারা খুব দুব্‌লা—তাদের নিয়ে কিন্তু ভূতের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যেয়ো না। যে কুনো সময় হার্টফেল করিয়ে যেতে পারে।

ভূতভাবন বাবাকে প্রণাম করলুম সকলেই। বিদায় নেওয়ার আগে যদুবাবু মনে করিয়ে দেওয়াতে মধুবাবু দুম্ করে ভূতভাবন বাবাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনি উড়নচণ্ডী বাবা বলে কোনো হাফসাধু বা ভণ্ড সাধুকে চেনেন?

— দাঁড়া। দাঁড়া। উড়নচণ্ডী আমার চেলা ছিল।

— ছিল মানে?

— এখুন নেই। আসলে ও ছিল মেদিন্‌পুরের ভৈরববাঁকির সরদার উড়নমুরমু। হামার চেলা হইয়ে নাম নিল উড়নচণ্ডী বাবা। কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করলে, কিন্তু হঠাৎ সাধনা ছেড়ে দিয়ে সাধুবাবা হইয়ে গেল। হামায় একদিন বলল, হামি ইবার নিজেই চেলা বানাব, সাধুবাবা হব। আমি বললুম—উড়ন ভাগ যা ইহাসে।

— তারপর ?

— তারপর উড়ন আমার আশ্রম থেকে চলিয়ে গেল—,তারপর সাগর সঙ্গমে যাবার সময় বাসে চাপা পড়ে মরে গেল।

মধুবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাবা আপনি ঠিক জানেন যে বাস অ্যাক্সিডেন্টে উড়নচন্ডী মারা গেছে ?

— হ্যাঁ, খবর পেয়ে যখন হাসপাতালে গিয়েছি—তখন দেখি ওর শেষ। মাথার খুলিই চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

— অ্যাঁ —

বলেই মধুবাবু গোঁ গোঁ করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

ভূতভাবন বাবা বললেন, হঠাৎ এর হোল কি, এরকম ভিরমী খেয়ে পড়ল কেন ?

যদুবাবু বললেন, উড়নচন্ডী বাবার সঙ্গে গত সপ্তাহে আমাদের দেখা হয়েছিল।

— কি বুলছিস ?

— ঠিকই বলছি বাবা, উনি আমাদের ঢাকুরের ক্লাবে হাজির হয়েছিলেন।

— তারপর ?

— মধুবাবুকে চেলা করতে চেয়েছেন, আর মধুবাবুকে নাকি নাঙা ফকির বানিয়ে ছাড়বেন, বলেছেন।

— সর্বনাশ।

— সর্বনাশ কেন বাবা ?

— একে ভূত, তায় উড়নচন্ডী—একটা কিছু করে বসবেই, তাই বলছি মধুবাবুর জন্য যজ্ঞ করা দরকার।

মধুবাবুর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হোল। ভূতভাবন বাবার সব কথা শুনে—মধুবাবু ভূতভাবন বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললেন, বাবা ! আমায় বাঁচান, যজ্ঞের জন্য যত টাকা লাগে দেব। উড়নচন্ডী ভয়ানক—বেঁচে থাকতে ছিল চ্যাংড়া ডাকাত—মরে গিয়ে হয়েছে উড়নচন্ডী বাবা ভূত—আমি ওর চেলা হতে চাই না। নাঙা ফকির হওয়ারও আমার কোনো ইচ্ছে নেই। বাবা, আপনি আমায় বাঁচান।

ভূতভাবন মধুবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে ! ঠিক আছে—তুই আমার সঙ্গে পরে দিখা করিস তোর একটা ব্যবস্থা আমি করিয়ে দেব।

ইংরাজী তারিখ ২১ শে আগস্ট, ১৯৮৭। বাংলা তারিখ ৫ই ভাদ্র, শনিবার।

ভুতভাবন বাবার কথা মতো ভূত দর্শনের আশায় রাত সাড়ে আটটার সময়ে আমরা ঢাকুরিয়া লেকে নির্জন বেঞ্চিতে সমাসীন হয়েছি। আমি, নরহরিবাবু, যদুবাবু, পটল গড়গড়ি মশায় এবং বজরংবলীবাবু।

রিটায়ার্ড দারোগা মধুবাবু তাঁর লাইসেন্স করা পিস্তল থাকা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে আসেন নি। তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেছেন, উড়নচণ্ডী ভূতই যখন আমার পেছনে লেগেছে, তখন আমি আর কোন ভরসায় আপনাদের সঙ্গে ভূত দেখতে যাই বলুন। যদি উড়নচণ্ডী এসে আমাকে আপনাদের সবার সামনে থেকে জাপটে ধরে নিয়ে যায়, তখন?

পটলবাবু বললেন, উড়নচণ্ডী যদি সত্যি সত্যি ভূতই হয়ে থাকে, তবে আপনাকে বাড়ির ভেতর থেকেও ধরে নিতে পারে মশাই।

—না তা পারে না, বাড়ির ভেতর ভূত সাহস করে ঢোকে না। বাড়ির ভেতর ঠাকুর দেবতার ছবি থাকে। আর শনিবার আর মঙ্গলবার সর্বদাই আমি ঠাকুর ঘরে থাকি — আর রাম নাম জপ করি।

অতএব মধুবাবুকে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে আনা গেল না। মধুবাবুর পরিবর্তে বজরংবলীবাবুকে অনেক অনুরোধ করেই আমরা সঙ্গে এনেছি।

বজরংবলীবাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমাদের থেকে জুনিয়র। চেহারাখানা বেশ তাগড়া। জীবনে বহুবার কুস্তি লড়ে নাকি বহু লোককে কাৎ করে দিয়েছেন। তাছাড়া ভূত-টুতে উনি বিশ্বাস করেন না।

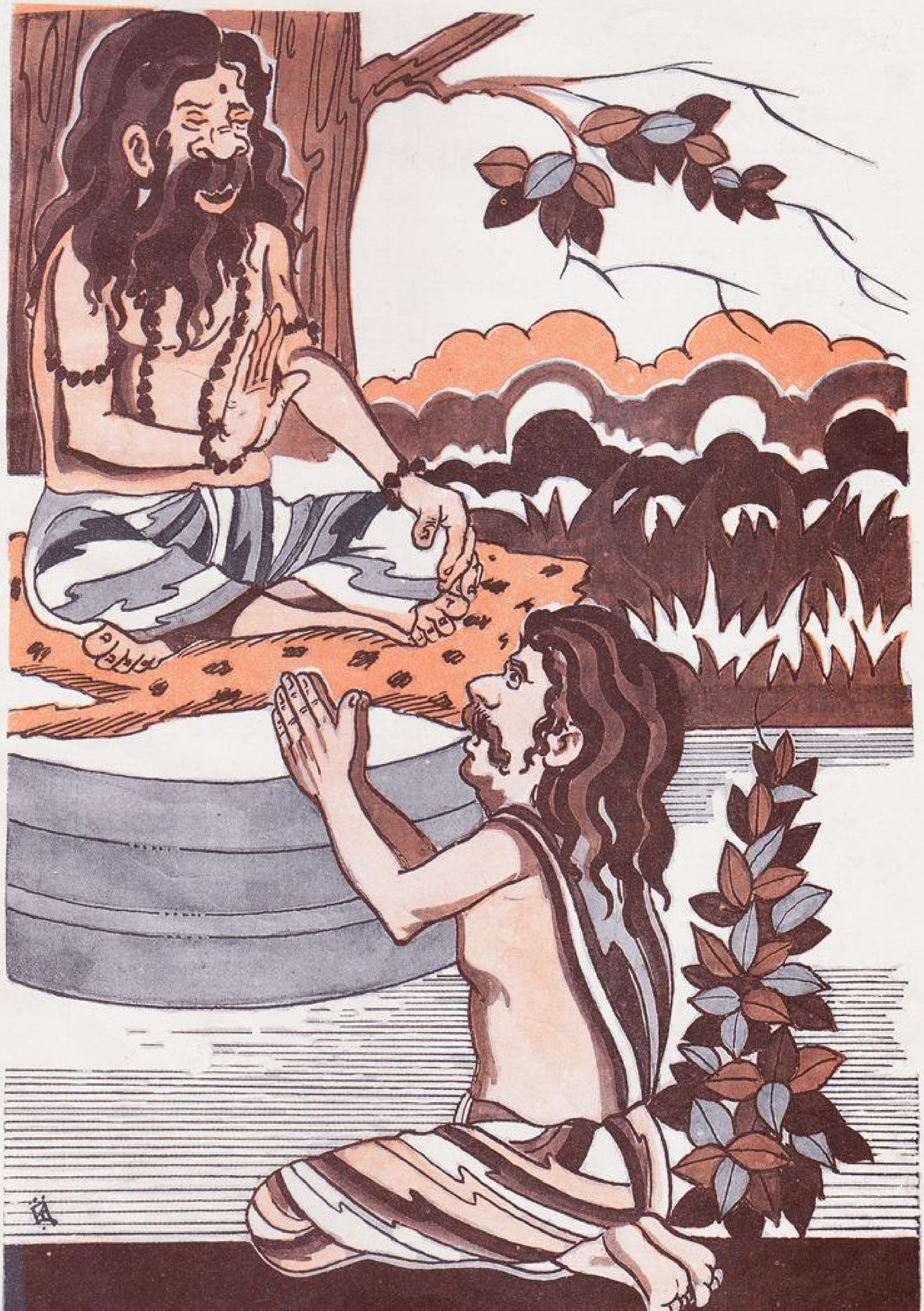

ভূতের কথা শুনে উনি পটলবাবুকে বলেছেন, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর কথা শুনেছেন তো, পটলবাবু ?

—শুনেছি।

—আমি তেমনি অনেক ভূতকে কিলিয়ে কিলিয়ে মানুষ বানিয়ে দিয়েছি।

—বলেন কী ?

—ঠিকই বলছি মশায়।

—তাঁরা নিশ্চয়ই আসল ভূত ছিল না, নকল ভূত ?

—আসল ভূত আবার আছে নাকি ? তা'ও এই কোলকাতায় ?

—আছে বৈকি, আমরা তো তার সঙ্গেই মোলাকাৎ করতে যাচ্ছি।

বজরংবলীবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, তবে তো ভালোই হ'লো। আজ আসল ভূত কিলিয়েই নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করব মশাই—ভূতও বুঝতে পারবে কার পাল্লায় পড়েছে।

অতএব কুস্তিগীর বজরংবলীবাবুকে নিয়ে আমরা ঢাকুরিয়া লেকে একটি বেঞ্চিতে আসীন হলাম।

ন'টা বেজে যাওয়ার পরও ভূত না আসায় বজরংবলী ঠাট্টা করে বললেন, আপনাদের ভূতভাবন বাবা, উড়নচণ্ডী বাবা সবই একদলের লোক, সব ভন্ড, সব বুজরুক। যাওবা আপনাদের ভয় দেখাতে এখানে হানা দিত, দূর থেকে আমাকে দেখেই কাট মেরেছে, বুঝলেন মশাই। আমার নাম বজরংবলী সিং।

পটলবাবু খুসি হয়ে বললেন, আমার মনে হয় ভূত-টুতের ব্যাপারটাই ধোঁকা। সব বুজরুকি ব্যাপার।

পটলবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা কালো লম্বা লোক আমাদের প্রায় কাছাকাছি চলে এল। পরণে সাদা কাপড়, গায়ে সেই সাদা কাপড়ের কিছুটা জড়ানো। দেখে গেঁয়ো লোক বা চাকর-বাকর ধরনেরই মনে হল। তবে লোকটা বেশ লম্বা এবং রোগা পটকা।

লোকটা আমাদের কাছাকাছি এসে কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল, বাবুরা, এত রাতি ইখানে কি কইরতেছেন ?

পটলবাবু বললেন, রাত আর তেমন কি, সবেতো রাত সাড়ে নটা।

বজরংবলীবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, তুমি কি লেকের দরোয়ান নাকি যে

রাতে আমরা এখানে কি করছি তা তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে ?

—না-না। আমার কাছে জবাব দেবেন কেন ? তবে পুলিশ আলি জবাব দিতি তো হবি। বেশি রাতে ছোকরাগুলান ঘোরাঘুরি কইরলে পুলিশ আসি জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে আপনারা বুড়ো-হাবড়া হইয়ে এত রাতে কি কইরতেছেন ?

বজরংবলীবাবু বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছ, বসে আছি।

—সি তো দেখতি পারতেছি।

বজরংবলীবাবু চটে গিয়ে বললেন, তার আগে বলো তুমি কে ? কি কারণে তোমার আগমন ?

—তা আইজ্ঞা আমিই বা আপনাদের কাছে জবাবদিহি করতি যাব কোন দুঃখে?

বজরংবলীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমায় দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা না হ'লে তোমাকে মেরে তক্তা করে পুলিশের কাছে দিয়ে আসব।

লোকটা বলল, যদিও পুলিশকে এখুন আর আমি মোটেও ভয় পাইনে—তবু আপনি ইচ্ছে করলি আমাকে যা খুসি জিজ্ঞাসা করতি পারেন।

—আগে পুলিশকে ভয় পেতে—এখন আর ভয় পাও না কেন ?

—হুজুর, সত্যি কথা বইলব ?

—মিথ্যে কথা বললে আমার কাছে পার পাবে না।

—হুজুর আগে চুরি-চামারি করতুম, তাই পুলিশকে ভয় পেতুম। এখুন আর ওসব করি না, তাই পুলিশকেও ভয় পাইনে।

—তাই নাকি, তা তোমার নামটা কি ?

—পরান মন্ডল।

—থাকো কোথায় ?

—রাস্তার ওপাশে, পঞ্চাননতলা বস্তিতে আগে থাকতুম।

—এখন থাকো কোথায় ?

—এখুন যিখানে-সিখানে থাকি, যখন খুসি যাই আসি।

—বুঝেছি—নানা ছেলেপুলের আড্ডায় ঘুইরে বেড়াও। তা এত রাতে লেকে ঘুরচ কেন, চুরি করার মতলব বুঝি ?

—আইজ্ঞে না।

—তবে?

—এখানে ভূত দেখতি আলাম।

পটলবাবু প্রায় ট্যারা হয়ে জিগ্যেস করলেন, কি বললে?

—এই সময় ইখানেতে ভূত দেখতি আলাম।

—এখানে এসময়ে ভূত আসবে তুমি জানলে কি করে?

—গরফের ভূতভাবন বাবার কাছে গিয়েছিনু, উনি—বইললেন যদি ভূত দেখতি চাস শনিবার রাতে কইলকাতার লেকে চইলে যাস ভূত দেখতি পাবি। তাই ইখানে আসা।

বজরংবলীবাবু হেসে উঠে বললেন, ভূতভাবন বাবা বোকা বানিয়েছেন, এই এনাদেরও। আমি যখন এখানে এসে পড়েছি তখন এখানে আর নকল ভূত আসতে সাহস পাবে না।

—কিন্তু আসল ভূত তো আসতি পারে?

বজরংবলীবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, আমার ভয়ে আসল বা নকল কোনো ভূতই এখানে আসতে সাহস পাবে না।

—কিনো বাবু, আপনি ভূতের ওঝা নাকি?

—তারও বাবা। এবার ভূত এলে একবার ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে দেখতাম।

—উরে ব্বাস্! তা হুজুর, ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার আগে একবার আমার সঙ্গে পাঞ্জা লইড়ে দেখুন না।

—তোমার ঐ হাড়গিলে চেহারা—সরু হাত, একটু চাপ দিলেই যে ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু ফিরিঙ্গে লোকটাও পেছ-পা হবার পাত্তর নয়। সে বললে, কে কার হাত ভাঙ্গে দেখা যাক্ না—মুখেতি অমন বড়ো বড়ো কতা সকলেই বলতি পারে, কাজে কইরে দেখান।

পটলবাবু বজরংবলীবাবুকে বললেন, একথা বলার পর বজরংবলীবাবু আপনার আর চুপ্‌চাপ বসে থাকা চলে না। বেটার বড়ো আস্পদ্দা, ঐতো লিকলিকে চেহারা—একবার পাঞ্জা লড়ে হাতখানা ভেঙ্গে দিন তো।

অতএব বজরংবলীবাবু হাত বাড়ালেন। কালো প্যাকাটির মতো লোকটাও

হাত বাড়াল। একটু পরেই বজরংবলীবাবুর চিৎকার শোনা গেল, উরে বাবা, গেছিরে গেছিরে—আঙুল ভেঙে গেল রে!

একটু পরেই লোকটা বজরংবলীবাবুকে ছেড়ে দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

নরহরিবাবু বললেন, লোকটা আসলে মানুষ নয়। আমি দেখলুম লেকের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে রেললাইনের দিকে চলে গেল।

বজরংবলীবাবু হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। লেকের জল ছিটিয়ে যদুবাবু তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেই, বজরংবলীবাবু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলেন, সেই কালো ফিরিঙ্গে লোকটা চলে গেছে?

নরহরিবাবু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, হ্যাঁ।

বজরংবলীবাবু প্রায় হাঁফ ছেড়ে বললেন, লোকটা মনুষ্য নয় মোটেই, ঐ লিকলিকে হাতে এত জোর হয় না। লোকটা আমার হাতের আঙুলগুলো ভেঙ্গে দিয়ে গেছে—উরে বাবা! উরে বাবা! কি যন্ত্রণারে—আমাকে এখুনি ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

বলা বাহুল্য, নরহরিবাবুকেই বজরংবলীবাবুকে গাড়ি করে নার্সিং হোমে পৌঁছে দিতে হো'ল।

ফেরার পথে নরহরিবাবু গাড়িতেই পটলবাবুকে জিগ্যেস করলেন, মিঃ গড়গড়ি, আপনার ভূত দেখার আশ মিটেছে তো?

পটলবাবু এতক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন। এবার মুখ খুলে বললেন, মোটেও না, লোকটা ভূতই নয়।

নরহরিবাবু বললেন, আমি যে দেখলুম লোকটা লেকের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। তাছাড়া বজরংবলীবাবুর আঙুল ভেঙ্গে গেল!

পটলবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, লোকটাকে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে কেবল নরহরিবাবু আপনি একাই দেখেছেন?

আমি বললুম, আমি অতোটা খেয়াল করিনি।

যদুবাবু বললেন, আমিও খেয়াল করিনি। কিন্তু বজরংবলীবাবুর ব্যাপারটা?

পটলবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, কে জানে, বজরংবলীবাবুকে হয়তো বা নরহরিবাবু আগেই ম্যানেজ করে রেখেছেন—হয়েতো তাঁর আঙুল-টাঙুল কিস্যু ভাঙ্গেনি।

পটলবাবুর কথা শুনে নরহরিবাবু ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনাকে আমি আরও ভূত দেখাব, তাছাড়া ভূতের নৃত্যও দেখাব।

৮ই আগষ্ট, ১৯৮৭—মঙ্গলবার। দিন দুপুরে অর্থাৎ বেলা দু'টো-আড়াইটেতে লাল দিঘির পারেই ভূতের দেখা পাওয়ার কথা।

বেলা একটার সময় সদলবলে নরহরিবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। এবার অবশ্য বজরংবলীমশায় নেই। তাঁর বদলে স্বয়ং গদাই লস্কর গদা সহ গাড়িতে সামিল হয়েছেন।

গদাই লস্কর ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না মোটে। তাছাড়া খোদ কোলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দিন দুপুরে বেলা দু'টোর সময় ভূতের আবির্ভাবের কথা ভাবাই যায় না। পটলবাবু অবশ্য টিপ্পনি কেটে নরহরিবাবুকে বললেন, আপনার গুরুদেব ভূতভাবন বাবার আবার সময়ের ভুল হয়নি তো, রাত দু'টোর বদলে হয়তো দুপুর দুটো বলে ফেলেছেন।

নরহরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার গুরুদেব এসব ব্যাপার কখনও ভুল করেন না।

অতএব বেলা দু'টোয় আমরা পাঁচজন আবার লাল দিঘির পারে ভূতের অপেক্ষায় বসে আছি। কেবল মাত্র গদাই লস্করের হাতে গদা। গদাই লস্কর গদা নিয়ে বসে থাকার জন্য—একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে।

মাঝে মাঝে অনেকেই আমাদের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন।

পটলবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূতেদেরও প্রাণের ভয় থাকে মশাই,

বেলা দুটোর সময় রাইটার্সের সামনে হানা দিতে সাহস পাবে না।

ঠিক দু'টো দশ মিনিটের সময় হঠাৎ কোত্থেকে একজন অ্যাংলো পুলিশ সার্জন এসে হাজির হল। গদাইবাবুর গদার দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করলে, ওটা কি?

—গদা!

—হোয়াট?

গদাই লস্কর বলল, মহাভারতের যুগে এটা অস্ত্র হিসাবে মহাবীর ভীম ব্যবহার বরতেন।

—অস্ত্র মানে উয়ীপন?

—হ্যাঁ।

—তোমার ঐ অস্ত্র নিয়ে উঠে এসো।

—কেন?

—আমার হুকুম—আমার নাম ম্যালকম মার্শাল। আমি পুলিশ সার্জন। তুমি কি জান না রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশেপাশে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা বে-আইনী।

অতএব সার্জন গদা সহ গদাই লস্করকে ধরে নিয়ে চলে গেল। দূরে একটা কালো গাড়ি দাঁড়ানো ছিল—সেই গাড়িতেই সার্জন ও গদাই লস্কর উধাও হয়ে গেল।

এব্যাপারে আমাদের কিছু করার ছিল না। পটলবাবু বললেন, গদাইটার সঙ্গে করে গদাটা আনা ঠিক হয়নি। গদা আনার জন্যই গোলমাল।

কিন্তু বিকেল চারটা পর্যন্ত বসে থেকেও যখন আমরা ভূতের দর্শন পেলাম না, তখন লালবাজারে গেলুম গদাই লস্করের খোঁজ করতে।

কিন্তু লালবাজারের এনকোয়ারির নানা লোক, এবং উপস্থিত পুলিশ অফিসাররা আমাদের কথা শুনে হেসেই অস্থির।

ম্যালকম মার্শাল নামে একজন অ্যাংলো পুলিশ সার্জন ছিল, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, আর তাছাড়া বাইশ বছর আগে সেই ম্যালকম মার্শাল মারা গেছেন।

আর গদা সহ কাউকে কোন কালে কোলকাতার থানায় অথবা লালবাজারে গ্রেপ্তার করেই আনা হয় নি।

কিন্তু আমরা চারজনে দিন দুপুরে যা স্বচক্ষে দেখলুম তা কি সব ভুল? সব মিথ্যে!

লালবাজারের একজন পুলিশ অফিসার পটলবাবুর মুখে নানা ফিরিস্তি শুনে বললেন, মানে মানে কেটে পড়ুন মশাই, নইলে আপনাদের চারজনকে ধরে দেখছি—রাঁচীর পাগলা গারদেই পাঠাতে হবে।

যদুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, আমি রীতিমত একজন উকিল, এভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

পুলিশ অফিসারটি বললেন, আপনাদের সঙ্গে অবান্তর কথা বলার আমার সময় নেই, কেটে পড়ুন।

রাতেরবেলা গদাই লস্করের বাড়িতে সব শুনে আরও অবাক হয়ে গেলাম। ঐ কালো গাড়ি গদাই লস্করকে নিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে ছেড়ে দেয়—সেখানে নাকি এক দু'জন ভূত নয়, অনেক ভূত। গদাই লস্কর ছুটতে ছুটতে বড় রাস্তায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভাগ্যিস এক চেনা লরী ড্রাইভার—সে ঐ পথ দিয়ে লরী নিয়ে ফিরছিল, সে-ই অজ্ঞান অবস্থায় গদাই লস্করকে গদা বিহীন অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

তার পর থেকে অনকেক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন গদাইবাবু। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হন নি। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে, আবার চলে যায়। যখনই একবার বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল তখনই এসব কথা বলেছেন।

২৯ শে আগস্ট, ১৯৮৭, শনিবার।

পটলবাবু বাজীতে হেরে গেলেও, তার মনে নতুন নতুন ভূত দেখার নেশা ধরে গিয়েছিল। অবশ্য যদুবাবু, আমি এবং নরহরির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

২৯ শে আগস্ট শনিবার আমরা পাঁচজন আবার গাড়ি করে ঠিক রাত দশটার সময় হাজির হলাম—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে—এবারকার উদ্দেশ্যও ভূতদর্শন।

এবার আমাদের সঙ্গে রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার বীরবিক্রম সিং মশায় রয়েছেন, তিনি সঙ্গে বন্দুক নিয়েছেন।

পনের মিনিট চুপচাপ্ বসে রয়েছি। হঠাৎ একটা বাঘের গর্জন শুনে আমরা পাঁচজনই কেঁপে উঠি। পটলবাবু থরথর করে কাঁপতে থাকেন। হঠাৎ যদুবাবু দুরের গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখুন ডোরাকাটা বাঘ।

সঙ্গে সঙ্গেই বীরবিক্রম বাহাদুর কাঁপতে কাঁপতেই সেই বাঘের উদ্দেশ্যে গুলি করেন। বাঘটাও ছুটতে থাকে আহত অবস্থাতেই, তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে।

পরের দিন খুব ভোরে আমরা পাঁচজন আবার হাজির হলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। বাঘটা যেখানে দেখা গিয়েছিল—সেই গাছটার নিচে বাঘের পায়ের ছাপ ও রক্ত দেখে আমরা পাঁচজনই অবাক হই।

ক ৫

নরহরিবাবু বললেন, এ নিশ্চয়ই বাঘা-ভূত। বীরবিক্রম বাহাদুর সিং বললেন, তাই হোবে, নইলে কোলকাতায় ইখানে বাঘ আসবে কি করে? আর আলিপুর চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে যদি কোন বাঘ বেরিয়ে আসত তবে খবরের কাগজে এবং চারদিকে নিশ্চয়ই হইচই পড়ে যেত।

কথা যুক্তিপূর্ণ বটে।

এই ঘটনার পর কেওড়াতলা শ্মশানে পয়লা সেপ্টেম্বর রাতে ভূত দর্শনের জন্য আমরা কেউ আর যাইনি। এতো বারবার ভূত দর্শনের ধাক্কা সামলানো মুশকিল। বলতে কি, আমরা অসুস্থই হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তবু মধুবাবুকে রক্ষা করা গেল না। ভূতভাবন বাবা চেষ্টা করলে অবশ্য পারতেন—কিন্তু তিনিও সে-চেষ্টা করার তেমন অবকাশ পাননি।

সেদিনও শনিবার, তায় অমাবস্যা। রাত দশটা হবে—আমরা আমাদের ঢাকুরের তাসারু ক্লাবে বসে তাস খেলছিলাম হঠাৎ দেখি লেংটি পরে আর

চিম্‌টা হাতে করে রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার মধুবাবু হাজির।

পটলবাবু গম্ভীর হয়ে জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার মধুবাবু?

—আর কি ব্যাপার! উড়নচণ্ডী বাবা আমাকে তাঁর চেলা বানিয়েই ছাড়ল। তাঁরই নির্দেশে এখন ভালুকপুরীর ঘাটে শ্মশানে যাচ্ছি।

যদুবাবু প্রায় কেঁদে ফেললেন।

মধুবাবু বললেন, কেঁদো না যদু। উড়নচণ্ডী বাবা আমার পেছনেই আছেন, বেশি কাঁদলে তোমার প্রতি বাবার নজর পড়তে পারে।

মধুবাবুর পেছনে এক বিরাট ছায়ামূর্তিই দেখলুম। তারপরই লোড শেডিং হয়ে গেল।